আল আ'লা

৮৭

নামকরণ

প্রথম আয়াতে উপস্থাপিত আ'লা শব্দটিকে এর নাম গণ্য করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

এর আলোচ্য বিষয় থেকে জানা যায়, এটি একেবারে প্রথম দিকে অবতীর্ণ সূরাগুলোর অন্যতম। ষষ্ঠ আয়াতে "আমি তোমাকে পড়িয়ে দেবো, তারপর তুমি আর ভুলবে না" এ বাক্যটিও একথা জানিয়ে দিচ্ছে যে, এটি এমন সময়ে অবতীর্ণ হয়েছিল, যখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভালোভাবে অহী আয়ত্ত করার অভ্যাস গড়ে তুলতে পারেননি। এবং অহী নাযিলের সময় তার কোন শব্দ ভুলে যাবেন বলে তিনি আশংকা করতেন। এই আয়াতের সাথে যদি সূরা ত্বা-হা'র ১১৪ আয়াত ও সূরা কিয়ামাহ'র ১৬-১৯ আয়াতগুলোকে মিলিয়ে পড়া হয় এবং তিনটি সূরার সংশ্লিষ্ট আয়াতগুলোর বর্ণনাভংগী ও পরিবেশ পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করা হয়, তাহলে এখানে উল্লেখিত ঘটনাবলীকে নিম্নোক্তভাবে সাজানো যায় ঃ সর্বপ্রথম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিশ্চয়তা দান করা হয়েছে যে, তুমি চিন্তা করো না, আমি এ বাণী তোমাকে পড়িয়ে দেবো এবং তুমি আর ভুলে যাবে না। তারপর বেশ কিছুকাল পরে যখন সূরা কিয়ামহ নাযিল হতে থাকে তখন তিনি অবচেতনভাবে অহীর শব্দগুলো পুনরাবৃত্তি করতে থাকেন। তখন বলা হয় "হে নবী। এই অহী দ্রুত মুখস্ত করার জন্য নিজের জিহবা সঞ্চালন করো না। এগুলো মুখস্থ করানো ও পড়িয়ে দেয়ার দায়িত্ব আমার। কাজেই যখন আমরা এগুলো পড়ি তখন তুমি এর পড়া মনোযোগ সহকারে শুনতে থাকো, তারপর এর মানে বুঝিয়ে দেয়ার দায়িত্বও আমার।" শেষবার সূরা ত্বা-হা নাযিলের সময় মানবিক দুর্বলতার কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবার এই পরপর নাযিল হওয়া ১১৩টি আয়াতের কোন অংশ স্মৃতি থেকে উধাও হয়ে যাবার আশংকা করেন, ফলে তিনি সেগুলো স্মরণ রাখার চেষ্টা করতে থাকেন। এর ফলে তাঁকে বলা হয় ঃ "আর কুরআন পড়ার ব্যাপারে তাড়াহুড়া করো না, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার কাছে এর অহী সম্পূর্ণরূপে পৌছে না যায়।" এরপর আর কখনো এমনটি ঘটেনি। নবী (সা) আর কখনো এ ধরনের আশংকা করেননি। কারণ এ তিনটি জায়গা ছাড়া কুরআনের আর কোথাও এ ব্যাপারে কোন ইংগিত নেই।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এই ছোট্ট সূরাটিতে তিনটি বিষয়বস্তুর অবতারণা করা হয়েছে। এক, তাওহীদ। দুই, নবী সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উপদেশ দান। তিন, আখেরাত।

তাওহীদের শিক্ষাকে প্রথম আয়াতের একটি বাক্যের মধ্যই সীমিত করে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ আল্লাহর নামে তাসবীহ পাঠ করো। অর্থাৎ তাঁকে এমন কোন নামে স্মরণ করা যাবে না যার মধ্যে কোন প্রকার ত্রুটি, অভাব, দোষ, দুর্বলতা বা সৃষ্টির সাথে কোন দিক দিয়ে কোন প্রকার মিল রয়ে গেছে। কারণ দুনিয়ায় যতগুলো ভ্রান্ত আকীদার জন্ম হয়েছে তার সবগুলোর মূলে রয়েছে আল্লাহ সম্পর্কিত কোন না কোন ভুল ধারণা। আল্লাহর পবিত্র সত্তার জন্য কোন ভুল ও বিভ্রান্তিকর নাম অবলম্বন করার মাধ্যমে এ ভুল ধারণাগুলো বিকশিত হয়েছে। কাজেই আকীদা সংশোধনের জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন হচ্ছে, মহান আল্লাহকে কেবলমাত্র তাঁর উপযোগী পূর্ণ গুণান্বিত ও সর্বাঙ্গ সুন্দর নামে স্মরণ করতে হবে।

এরপর তিনটি আয়াতে বলা হয়েছে, তোমাদের এমন এক রবের তাসবীহ পাঠ করার হুকুম দেয়া হয়েছে যিনি বিশ্ব–জাহানের প্রতিটি জিনিস সৃষ্টি করেছেন। তার মধ্যে সমতা কায়েম করেছেন। তার ভাগ্য তথা তার ক্ষমতাগুলোর সীমারেখা নির্ধারণ করেছেন এবং যে কাজের জন্য তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে তা সম্পন্ন করার পথ তাকে বাত্‌লে দিয়েছেন। তোমরা নিজের চোখে তাঁর ক্ষমতার বিস্ময়কর ও বিচিত্র প্রকাশ দেখে চলছো। তিনি মাটির বুকে উদ্ভিদ ও গাছপালা উৎপন্ন করেন আবার সেগুলোকে প্রাণহীন আবর্জনায় পরিণত করেন। তিনি ছাড়া আর কেউ বসন্তের সজীবতা আনার ক্ষমতা রাখেন না আবার পাতাঝরা শীতের আগমন রোধ করার ক্ষমতাও কারো নেই।

তারপর দু'টি আয়াতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উপদেশ দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ এই যে কুরআন তোমার প্রতি নাযিল হচ্ছে এর প্রতিটি শব্দ কিভাবে তোমার মুখস্থ থাকবে, এ ব্যাপারে তুমি কোন চিন্তা করো না। একে তোমার স্মৃতিপটে সংরক্ষিত করে দেয়া আমার কাজ। একে তোমার স্মৃতিপটে সংরক্ষিত রাখার পেছনে তোমার নিজস্ব কোন কৃতিত্ব নেই। বরং এটা আমার মেহেরবানীর ফল। নয়তো আমি চাইলে তোমার স্মৃতি থেকে একে মুছে ফেলতে পারি।

এরপর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলা হয়েছে ঃ প্রত্যেক ব্যক্তিকে সঠিক পথে পরিচালিত করার দায়িত্ব তোমাকে দেয়া হয়নি। বরং তোমার কাজ হচ্ছে শুধুমাত্র সত্যের প্রচার। আর এই প্রচারের সরল পদ্ধতি হচ্ছে, যে ব্যক্তি উপদেশ শুনতে ও তা মেনে নিতে প্রস্তুত থাকে তাকে উপদেশ দাও। আর যে ব্যক্তি তাতে প্রস্তুত নয় তার পেছনে লেগে থাকার প্রয়োজন নেই। যার মনে ভুল পথে চলার অশুভ পরিণামের ভয় থাকবে সে সত্য কথা শুনে তা মেনে নেবে এবং যে দুর্ভাগা তা শুনতে ও মেনে নিতে চাইবে না সে নিজের চোখেই নিজের অশুভ পরিণাম দেখে নেবে।

সবশেষে বক্তব্যের সমাপ্তি টেনে বলা হয়েছে ঃ সাফল্য কেবল তাদের জন্য যারা আকীদা–বিশ্বাস, কর্ম ও চরিত্রে পবিত্রতা ও নিষ্কলুষতা অবলম্বন করবে এবং নিজেদের রবের নাম স্মরণ করে নামায পড়বে। কিন্তু লোকেরা শুধুমাত্র এ দুনিয়ার আরাম–আয়েশ এবং এর স্বার্থ ও আশা–আনন্দের চিন্তায় বিভোর হয়ে আছে। অথচ তাদের আসলে আখেরাতের চিন্তা করা উচিত। কারণ এ দুনিয়া তো ক্ষণস্থায়ী। অন্যদিকে আখেরাত চিরস্থায়ী। আর দুনিয়ার নিয়ামতের তুলনায় আখেরাতের নিয়ামত অনেক বেশী ও অনেক উন্নত পর্যায়ের। এ সত্যটি কেবল কুরআনেই বর্ণনা করা হয়নি, হযরত ইবরাহীম (আ) ও হযরত মূসার (আ) সহীফাসমূহেও মানুষকে এই একই সত্যের সন্ধান দেয়া হয়েছিল।

سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴿١﴾ الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّىٰ ﴿٢﴾ وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ ﴿٣﴾ وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَىٰ ﴿٤﴾ فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ ﴿٥﴾

(হে নবী!) তোমার সুমহান রবের নামের তাসবীহ পাঠ করো।[1] যিনি সৃষ্টি করেছেন এবং সমতা কায়েম করেছেন।[2] যিনি তাকদীর গড়েছেন[3] তারপর পথ দেখিয়েছেন।[4] যিনি উদ্ভিদ উৎপন্ন করেছেন।[5] তারপর তাদেরকে কালো আবর্জনায় পরিণত করেছেন।[6]

১. এর শাব্দিক অনুবাদ হবে, "তোমার সুমহান রবের নামকে পবিত্র ও মহিমাময় করো।" এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে এবং সবকটিই এখানে প্রযোজ্য। এক, আল্লাহকে এমন নামে স্মরণ করতে হবে যা তাঁর উপযোগী। তাঁর মহান সত্তার সাথে এমন নাম সংযুক্ত না করা উচিত যা অর্থের দিক দিয়ে তাঁর অনুপযোগী এবং তাঁর জন্য প্রযোজ্য নয়। অথবা যে নামে তাঁর জন্য কোন ত্রুটি, অমর্যাদা বা শিরকের চিহ্ন পাওয়া যায়। অথবা যাতে তাঁর সত্তা, গুণাবলী বা কার্যাবলী সম্পর্কে কোন ভুল বিশ্বাস পাওয়া যায়। এ জন্য কুরআন মজীদে আল্লাহ নিজেই নিজের জন্য যেসব নাম ব্যবহার করেছেন অথবা অন্য ভাষায় এই নামগুলোর সঠিক অনুবাদ যে শব্দগুলোর মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে সেগুলো ব্যবহার করাই হবে সবচেয়ে বেশী সংরক্ষিত পদ্ধতি। দুই, সৃষ্টির জন্য যেসব নাম নির্ধারিত রয়েছে সেগুলো আল্লাহর জন্য ব্যবহার করা অথবা আল্লাহর জন্য ব্যবহৃত নামগুলো সৃষ্টির জন্য ব্যবহার করা যাবে না। আর যদি এমন কিছু গুণবাচক নাম থাকে যেগুলো শুধু আল্লাহর জন্য বিশেষভাবে ব্যবহৃত না হয়ে থাকে বরং বান্দার জন্যও সেগুলোর ব্যবহার বৈধ হয় যেমন রউফ (পরম স্নেহশীল), রহীম (পরম করুণাময়) করীম (মেহেরবান), সামী (সবকিছু শ্রবণকারী), বসীর (সর্বদ্রষ্টা) ইত্যাদি, তাহলে এ ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। অর্থাৎ আল্লাহর জন্য এ শব্দগুলো যেভাবে ব্যবহার করা হয় বান্দার জন্য ঠিক সেভাবে ব্যবহার করা যাবে না। তিন, পরম শ্রদ্ধা, ভক্তি ও মর্যাদাসহকারে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করতে হবে। এমন কোন পদ্ধতিতে বা এমন কোন অবস্থায় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা যাবে না, যা তাঁর প্রতি মর্যাদাবোধের পরিপন্থী। যেমন হাসি–ঠাট্টা করতে করতে, মলমূত্র ত্যাগকালে অথবা কোন গোনাহ করার সময় তাঁর নাম উচ্চারণ করা। অথবা এমন লোকদের সামনে তাঁর নাম উচ্চারণ করা যারা তা শুনে বেআদবী করতে থাকবে। এমন মজলিসেও তাঁর নাম বলা যাবে না। যেখানে লোকেরা অশালীন কাজে লিপ্ত

থাকে এবং তাঁর নাম উচ্চারিত হবার সাথে সাথে তারা বিদ্রূপ করতে থাকবে। আবার এমন অবস্থায়ও তাঁর পবিত্র নাম মুখে আনা যাবে না যখন আশংকা করা হবে যে, শ্রোতা তাঁর নাম শুনে বিরক্তি প্রকাশ করবে। ইমাম মালেকের (র) জীবনেতিহাসে একথা উল্লেখিত হয়েছে যে, কোন প্রার্থী তাঁর কাছে কিছু চাইলে তিনি যদি তাকে তা দিতে না পারতেন তাহলে সাধারণ লোকদের মতো "আল্লাহ তোমাকে দেবেন" একথা না বলে অন্য কোনভাবে নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করতেন। লোকেরা এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, প্রার্থীকে কিছু না দিয়ে অক্ষমতা প্রকাশ করলে আসলে তার মনে বিরক্তি ও ক্ষোভের সঞ্চার হয়। এ অবস্থায় আল্লাহর নাম নেয়া আমি সংগত মনে করি না। কারণ সে বিরক্তি ও ক্ষোভের সাথে আল্লাহর নাম শুনবে।

হাদীস গ্রন্থসমূহে হযরত উকবাহ ইবনে আমের জুহানী (রা) থেকে রেওয়ায়াতে উদ্ধৃত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ আয়াতের ভিত্তিতেই সিজদায় سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى পড়ার হুকুম দিয়েছিলেন। আর রুকূ'তে তিনি سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ পড়ার যে নির্দেশ দিয়েছিলেন তার ভিত্তি ছিল সূরা ওয়াকিয়ার শেষ আয়াতটি فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ (মুসনাদে আহমাদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান, হাকেম ইবনুল মুনযির)

২. অর্থাৎ পৃথিবী থেকে আকাশ পর্যন্ত সমগ্র বিশ্ব-জাহানের প্রত্যেকটি জিনিস সৃষ্টি করেছেন। আর যে জিনিসটিই সৃষ্টি করেছেন তাকে সঠিক ও সুঠাম দেহসৌষ্ঠব দান করেছেন তার মধ্যে ভারসাম্য ও শক্তির অনুপাত সঠিকভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাকে এমন আকৃতি দান করেছেন যে, তার জন্য এর চেয়ে ভালো আকৃতির কল্পনাই করা যেতে পারে না। একথাটিকে সূরা আস সাজদায় নিম্নোক্তভাবে বলা হয়েছে ঃ اَلَّذِيْ اَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ "তিনি প্রত্যেকটি জিনিসকে চমৎকার তৈরি করেছেন।" এভাবে দুনিয়ার প্রত্যেকটি জিনিসের যথোপযোগী ও যথা অনুপাতে সৃষ্টি হওয়াটাই একথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, কোন এক মহাবিজ্ঞ স্রষ্টা এসব কিছু সৃষ্টি করেছেন। কোন আকস্মিক ঘটনাক্রমে অথবা বহু স্রষ্টার কর্মতৎপরতায় বিশ্ব-জাহানের এই অসংখ্য অংশের সৃষ্টিতে এ ধরনের সুষ্ঠু রুচিশীলতা এবং সামগ্রিকভাবে এদের সবার অংশের সম্মিলনে বিশ্ব-জাহানে এ ধরনের শোভা ও সৌন্দর্য সৃষ্টি হওয়া সম্ভবপর নয়।

৩. অর্থাৎ প্রতিটি জিনিস সৃষ্টি করার আগে দুনিয়ায় তাকে কি কাজ করতে হবে, এই কাজ করার জন্য তাকে কতটুকু সময় দেয়া হবে, তার আকার-আকৃতি কেমন হবে, তার মধ্যে কি কি গুণাবলী থাকবে, তার স্থান কোথায় হবে, তার জন্য প্রতিষ্ঠা ও স্থায়িত্ব এবং কাজের জন্য কি কি সুযোগ-সুবিধা ও উপায়-উপকরণ সরবরাহ করা হবে, কখন সে অস্তিত্ব লাভ করবে, নিজের অংশের কাজটুকু সে কতদিনে সম্পন্ন করবে এবং কবে কিভাবে সে খতম হয়ে যাবে, এসব কিছুই ঠিক করে দিয়েছেন। এই সমগ্র পরিকল্পনাটির সামগ্রিক নাম হচ্ছে "তাকদীর"। বিশ্ব-জাহানের প্রতিটি জিনিসের জন্য এবং সামগ্রিকভাবে সমগ্র বিশ্ব-জাহানের জন্য মহান আল্লাহ এই তাকদীর গড়েছেন। এর অর্থ হচ্ছে, কোন রকম পূর্ব পরিকল্পনা ছাড়াই এমনি হঠাৎ উদ্দেশ্যহীনভাবে এই সৃষ্টিকর্ম সম্পন্ন হয়নি। বরং স্রষ্টার সামনে এ জন্য একটি পূর্ণ পরিকল্পনা ছিল। সবকিছুই সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী সম্পন্ন হচ্ছে। (আরো বেশী ব্যাখ্যা জানার জন্য তাফহীমুল কুরআন,

আল হিজর, ১৩-১৪ টীকা, আল ফুরকান ৮ টীকা, আল ক্বামার ২৫ টীকা এবং আবাসা ১২ টীকা দেখুন।)

৪. অর্থাৎ কোন জিনিসকে কেবলমাত্র সৃষ্টি করেই ছেড়ে দেননি বরং যে জিনিসকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করেছেন তাকে সেই কাজ করার পদ্ধতিও বাতলে দিয়েছেন। অন্য কথায় তিনি শুধুমাত্র স্রষ্টাই নন, পথপ্রদর্শকও। যে জিনিসটিকে তিনি যে মর্যাদার অধিকারী করে সৃষ্টি করেছেন তাকে তার উপযোগী পথনির্দেশনা দেবার এবং তার জন্য শোভনীয় উপায়ে পথ দেখাবার দায়িত্ব তিনি নিজেই গ্রহণ করেছেন। পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ ও তারকাকে তিনি এক ধরনের পথ দেখিয়েছেন। সে পথে তারা চলছে এবং তাদের ওপর যে কাজের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে তা সম্পাদন করে যাচ্ছে। আর এক ধরনের পথনির্দেশনা দিয়েছেন পানি, বায়ু, আলো, জড়পদার্থ ও খনিজপদার্থকে। সেই অনুযায়ী যে কাজের জন্য তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে ঠিক সেই কাজই তারা করে যাচ্ছে। উদ্ভিদকে অন্য এক ধরনের পথনির্দেশনা দিয়েছেন। সেই অনুযায়ী তারা মাটির অভ্যন্তরে নিজেদের শিকড় বিস্তার করছে ও মাটির বুক চিরে অংকুরিত হচ্ছে। যেখানে যেখানে আল্লাহ তাদের জন্য খাদ্য সৃষ্টি করে রেখেছেন সেখান থেকে তা আহরণ করছে। কাণ্ড ও শাখা-প্রশাখা বিস্তার করছে, পাতা ও ফুলে ফলে সুশোভিত হচ্ছে এবং তাদের প্রত্যেকের জন্য যে কাজ নির্ধারিত করা হয়েছে তা করে যাচ্ছে। এক ধরনের পথনির্দেশনা দিয়েছেন স্থলভাগ, জলভাগ ও শূন্যে উড্ডয়নশীল অসংখ্য প্রজাতির এবং তাদের প্রত্যেকটি প্রাণীর জন্য। প্রাণীদের জীবন যাপন এবং তাদের কার্যকলাপে এর বিস্ময়কর ও সুস্পষ্ট প্রকাশ ঘটেছে। এমনকি একজন নাস্তিকও অবশেষে একথা মানতে বাধ্য হয় যে, বিভিন্ন ধরনের প্রাণীরা এমন কিছু নৈসর্গিক জ্ঞানের অধিকারী হয় যা মানুষ তার ইন্দ্রিয় তো দূরের কথা নিজের যন্ত্রপাতির সাহায্যেও অর্জন করতে পারে না। তারপর মানুষের জন্য রয়েছে আবার দু'টি আলাদা ধরনের পথনির্দেশনা। তার মধ্যে যে দুই ধরনের অবস্থা বিরাজ করছে তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে এ পথনির্দেশনা দেয়া হয়েছে। এক ধরনের পথনির্দেশনার সম্পর্ক রয়েছে মানুষের জৈবিক জীবনের সাথে। এরি বদৌলতে প্রতিটি মানব শিশু ভূমিষ্ঠ হবার সাথে সাথেই দুধ পান করা শিখে নেয়। এরি মাধ্যমে মানুষের চোখ, নাক, কান, হৃদয়, মস্তিষ্ক, যকৃৎ, হৃদপিণ্ড, কলিজা, ফুসফুস, পাকস্থলী, অন্ত্র, স্নায়ু, শিরা-উপশিরা সবকিছু যার যার কাজ করে যাচ্ছে। এ ব্যাপারে মানুষ সচেতন থাক বা নাই থাক তাতে কিছু আসে যায় না। তারি ইচ্ছা-অনিচ্ছার সাথে এই অংগ-প্রত্যংগগুলোর কাজের কোন সম্পর্ক নেই। এ পথনির্দেশনার আওতাধীনেই মানুষের মধ্যে শৈশব, কৈশোর, যৌবন, পৌঢ়ত্ব ও বার্ধক্যাবস্থায় এমন সব শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন আসতে থাকে যা কোথাও এবং কোন ক্ষেত্রেই তার ইচ্ছা, সংকল্প, আশা-আকাংক্ষা এমন কি তার চেতনা শক্তিরও মুখাপেক্ষী নয়। দ্বিতীয় পথনির্দেশনাটির সম্পর্ক হচ্ছে মানুষের বুদ্ধি ও চেতনাগত জগতের সাথে। চেতনাহীন জগতের পথনির্দেশনা থেকে এর ধরন সম্পূর্ণ আলাদা। কারণ জীবনের এ বিভাগে মানুষকে এক ধরনের স্বাধীন কর্মক্ষমতা দান করা হয়েছে। যার ফলে যে ধরনের পথনির্দেশনা স্বাধীন কর্মক্ষমতাবিহীন জীবনের উপযোগী তা এ বিভাগের জন্য মোটেই উপযোগী নয়। এ দ্বিতীয় পর্যায়ের পথনির্দেশনাটি থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবার জন্য মানুষ যতই চেষ্টা করুক এবং যতই যুক্তি-তর্কের আশ্রয় নিক না কেন, যে স্রষ্টা এই সমগ্র বিশ্ব-জাহানে প্রতিটি জিনিসকে তার আকৃতি, প্রকৃতি ও অবস্থা

سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰٓ ﴿٦﴾ إِلَّا مَا شَاءَ اللّٰهُ ۚ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَىٰ ﴿٧﴾ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ ﴿٨﴾ فَذَكِّرْ إِنْ نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ ﴿٩﴾ سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَّخْشَىٰ ﴿١٠﴾ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى ﴿١١﴾ الَّذِىْ يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ ﴿١٢﴾ ثُمَّ لَا يَمُوْتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيٰى ﴿١٣﴾

আমি তোমাকে পড়িয়ে দেবো, তারপর তুমি আর ভুলবে না।[৭] তবে আল্লাহ যা চান তা ছাড়া।[৮] তিনি জানেন প্রকাশ্য এবং যা কিছু গোপন আছে তাও।[৯]

আর আমি তোমাকে সহজ পথের সুযোগ সুবিধা দিচ্ছি। কাজেই তুমি উপদেশ দাও, যদি উপদেশ উপকারী হয়[১০] যে ভয় করে সে উপদেশ গ্রহণ করে নেবে।[১১] আর তার প্রতি অবহেলা করবে নিতান্ত দুর্ভাগাই, যে বৃহৎ আগুনে প্রবেশ করবে, তারপর সেখানে মরবেও না, বাঁচবেও না।[১২]

অনুযায়ী পথনির্দেশনা দেবার ব্যবস্থা করেছেন তিনি মানুষকে এই দুনিয়ায় স্বাধীনভাবে সব জিনিস ভোগ-ব্যবহার করার ক্ষমতা দিয়েছেন ঠিকই কিন্তু এই ক্ষমতা ব্যবহারের সঠিক ও ভ্রান্ত পদ্ধতি কি হতে পারে তা তাকে জানিয়ে দেননি, একথা অবশ্যি মেনে নেবার কোন কারণ নেই। (আরো বেশী ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আন নাহল ৯, ১০, ১৪ ও ৫৬ টীকা, ত্বা-হা ২৩ টীকা, আর রহমান ২ ও ৩ টীকা এবং আদ দাহ্‌র ৫ টীকা)।

৫. মূলে মারআ (مَرْعٰى) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। তৃণভূক প্রাণীদের খাদ্যের জন্য এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কিন্তু আয়াতের পরবর্তী আলোচনা থেকে বুঝা যায়, এখানে কেবল উদ্ভিদজাত খাদ্যের কথা বলা হয়নি বরং মাটিতে উৎপন্ন সব ধরনের উদ্ভিদের কথাই বলা হয়েছে।

৬. অর্থাৎ তিনি কেবল বসন্তকালের আগমন ঘটান না, শীতেরও আগমন ঘটান। তোমাদের চোখ তাঁর উভয় প্রকার ক্ষমতার প্রকাশই দেখছে। একদিকে তিনি সবুজ শ্যামল বৃক্ষলতায় ভরে দেন। তাদের তরুতাজা শ্যামল শোভা দেখে মন আনন্দে ভরে ওঠে। আবার অন্যদিকে এ বৃক্ষলতাকে তিনি শুষ্ক শ্রীহীন করে কালো জঞ্জালে পরিণত করেন। এগুলো বাতাসে উড়ে বেড়ায় এবং বন্যার স্রোতে খড়কুটোর মতো ভেসে যায়। তাই এই দুনিয়ায় কোন ব্যক্তির এই ভুল ধারণা করা উচিত নয় যে, সে এখানে কেবল বসন্তকালই দেখবে, শীতের সাথে তার সাক্ষাতই হবে না। এই একই বক্তব্য কুরআন মজীদের বিভিন্ন জায়গায় অন্যভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। যেমন দেখুন সূরা ইউনুস ২৪ আয়াত, সূরা কাহাফ ৪৫ আয়াত এবং সূরা হাদীদ ২০ আয়াত।

৭. হাকেম হযরত সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্‌কাস (রা) থেকে এবং ইবনে মারদুইয়া হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। তারা বলেন, রসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভুলে যাবার ভয়ে কুরআনের শব্দগুলোর পুনরাবৃত্তি করতে থাকতেন। মুজাহিদ ও কালবী বলেন, জিব্রীল অহী শুনিয়ে শেষ করার আগেই ভুলে যাবার আশংকায় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গোড়ার দিক থেকে আবার পড়তে শুরু করতেন। এ কারণে আল্লাহ তাঁকে নিশ্চয়তা দিয়ে বলেন, অহী নাযিলের সময় তুমি নিরবে শুনতে থাকো। আমি তোমাকে তা এমনভাবে পড়িয়ে দেবো যার ফলে চিরকালের জন্য তোমার মুখস্থ হয়ে যাবে। এর কোন একটি শব্দ তুমি ভুলে যাবে, এ ভয় করো না। এ নিয়ে তৃতীয়বার রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অহী আয়ত্ব করার পদ্ধতি শেখানো হয়। এর আগে আরো দু'বার সূরা 'ত্বা-হা'র ১১৪ আয়াতে এবং সূরা 'কিয়ামাহ'র ১৬-১৯ আয়াতে এর আলোচনা এসেছে। এই আয়াত থেকে একথা প্রমাণিত হয়, কুরআন যেমন মু'জিযা হিসেবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর নাযিল করা হয়েছিল ঠিক তেমনি মুজিযা হিসেবেই তার প্রতিটি শব্দ তাঁর স্মৃতিতে সংরক্ষিত করে দেয়া হয়েছিল। এর কোন একটি শব্দ তিনি ভুলে যাবেন অথবা একটি শব্দের জায়গায় তার সমার্থক অন্য একটি শব্দ তাঁর মুবারক কন্ঠ থেকে উচ্চারিত হবে, এ ধরনের সকল সম্ভাবনার পথই বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল।

৮. এই বাক্যটির দু'টি অর্থ হতে পারে। এক, সমগ্র কুরআনের প্রতিটি শব্দ তোমার স্মৃতিতে সংরক্ষিত হয়ে যাওয়ার পেছনে তোমার নিজের শক্তির কোন কৃতিত্ব নেই; বরং এটি আল্লাহর মেহেরবানী এবং তাঁর তাওফীকের ফল। নয়তো আল্লাহ চাইলে এগুলো তোমার স্মৃতি থেকে উধাও করে দিতে পারেন। এ বক্তব্যটি কুরআনের অন্যত্র নিম্নোক্তভাবে বলা হয়েছে ঃ وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِىٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ "আমি চাইলে অহীর মাধ্যমে তোমাকে যা কিছু দিয়েছি সব ছিনিয়ে নিতে পারি।" (বনি ইসরাঈল ৮৬) দুই, কখনো সাময়িকভাবে তোমার ভুলে যাওয়া এবং কোন আয়াত বা শব্দ তোমার কোন সময় ভুলে যাওয়া এই ওয়াদার ব্যতিক্রম। যে ব্যাপারে ওয়াদা করা হয়েছে তা হচ্ছে এই যে, তুমি স্থায়ীভাবে কুরআনের কোন শব্দ ভুলে যাবে না। সহী বুখারীর নিম্নোক্ত হাদীসটিকে এ অর্থের সমর্থনে পেশ করা যেতে পারে ঃ একবার ফজরের নামাযে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূরা পড়ার সময় মাঝখানে একটি আয়াত বাদ দিয়ে যান। নামাযের পর হযরত উবাই ইবনে কা'ব (রা) এ আয়াতটি মানসূখ (রহিত) হয়েছে কিনা জিজ্ঞেস করেন। জবাবে রসূলুল্লাহ (সা) বলেন, আমি ভুলে গিয়েছিলাম।

৯. এমনিতে এ শব্দগুলো সাধারণভাবে ব্যবহৃত এবং তার অর্থ এই যে, আল্লাহ গোপন ও প্রকাশ্য সবকিছুই জানেন। কিন্তু যে বক্তব্য প্রসঙ্গে একথাগুলো এখানে বলা হয়েছে তা সামনে রাখলে এর যা অর্থ দাঁড়ায় তা হচ্ছে ঃ তুমি জীব্রীলের (আ) সাথে সাথে যে কুরআন পড়ে চলেছো। তা আল্লাহ জানেন এবং ভুলে যাবার ভয়ে যে এমনটি করছো তাও আল্লাহ জানেন। তাই তাঁকে নিশ্চয়তা দান করে বলা হচ্ছে, তোমার ভুলে যাবার কোন সম্ভাবনা নেই।

১০. সাধারণভাবে মুফাস্সিরগণ এ দু'টি বাক্যকে পৃথক পৃথক অর্থে গ্রহণ করেছেন। তারা প্রথম বাক্যের অর্থ করেছেন, আমি তোমাদেরকে একটি সহজ শরীয়াত দিচ্ছি। এ শরীয়াত অনুযায়ী কাজ করা সহজ। আর দ্বিতীয় বাক্যটির অর্থ করেছেন, উপদেশ দাও, যদি তা কাজে লাগে। কিন্তু আমার মতে "ফাযাক্কির" (فَذَكِّرْ) শব্দটি উভয় বাক্যকে

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى ﴿١٤﴾ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى ﴿١٥﴾ بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ﴿١٦﴾ وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ﴿١٧﴾ اِنَّ هٰذَا لَفِى الصُّحُفِ الْاُوْلٰى ﴿١٨﴾ صُحُفِ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى ﴿١٩﴾

সে সফলকাম হয়েছে, যে পবিত্রতা অবলম্বন করেছে[১৩] এবং নিজের রবের নাম স্মরণ করেছে[১৪] তারপর নামায পড়েছে।[১৫] কিন্তু তোমরা দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দিয়ে থাকো।[১৬] অথচ আখেরাত উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী।[১৭] পূর্বে অবতীর্ণ সহীফাগুলোয় একথাই বলা হয়েছিল, ইবরাহীম ও মূসার সহীফায়।[১৮]

পরস্পর সংযুক্ত করে দিয়েছে এবং শেষের বাক্যটির বিষয়বস্তু প্রথম বাক্যটির বিষয়বস্তুর ওপরই সংস্থাপিত হয়েছে। তাই আল্লাহর এই বাণীটির অর্থ আমি যা বুঝেছি তা হচ্ছে ঃ হে নবী। দীন প্রচারের ব্যাপারে আমি তোমাকে কোন সংকটের মুখোমুখি করতে চাই না। যার শ্রবণশক্তি নেই তাকে শুনাতে হবে এবং যার দৃষ্টিশক্তি নেই তাকে দেখাতে হবে, এ ধরনের সংকটে তোমাকে ফেলতে চাই না। বরং তোমার জন্য একটি সহজ পথ তৈরি করে দিচ্ছি। সে পথটি হচ্ছে, যেখানে তুমি অনুভব করো কেউ উপদেশ গ্রহণ করতে এবং তা থেকে উপকৃত হতে প্রস্তুত সেখানে উপদেশ দিতে থাকো। এখন কে উপদেশ থেকে উপকৃত হতে এবং কে উপকৃত না হতে চায়, তার সন্ধান পাওয়া যেতে পারে সাধারণ প্রচারের মাধ্যমেই। কাজেই সাধারণ প্রচার জারী রাখতে হবে। কিন্তু সেখানে তোমাদের উদ্দেশ্য হবে এমনসব লোকদের খুঁজে বের করা যারা এর সাহায্যে উপকৃত হয়ে সত্য-সরল পথ অবলম্বন করবে। এসব লোকেই তোমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার অধিকার রাখে এবং এদের শিক্ষা-দীক্ষার প্রতি তোমাদের দৃষ্টি দিতে হবে। এদেরকে বাদ দিয়ে এমনসব লোকের পেছনে পড়ার তোমাদের কোন প্রয়োজন নেই। যাদের ব্যাপারে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তোমরা জানতে পেরেছো যে, তারা উপদেশ গ্রহণ করতে চায় না। প্রায় এই একই ধরনের বিষয়বস্তুই সূরা আবাসায় অন্যভাবে বর্ণনা করা হয়েছে সেখানে বলা হয়েছে ঃ "যে ব্যক্তি বেপরোয়া ভাব দেখায় তার প্রতি তুমি দৃষ্টি দিচ্ছো। অথচ সে সংশোধিত না হলে তোমার ওপর তার কী দায়িত্ব বর্তায়? আর যে ব্যক্তি নিজে তোমার কাছে দৌড়ে আসে এবং সে দৌড়রত রয়েছে, তার প্রতি তুমি অনাগ্রহ দেখাচ্ছো। এতো একটি উপদেশ, যে চায় এটা গ্রহণ করতে পারে।" (৫-১২ আয়াত)।

১১. অর্থাৎ যে ব্যক্তির মনে আল্লাহর ভয় এবং খারাপ পরিণতির আশংকা থাকবে সেই ভাবতে থাকবে যে, সে ভুল পথে যাচ্ছে কি-না এবং সেই ব্যক্তিই হেদায়াত ও গোমরাহীর পার্থক্য এবং সাফল্য ও সৌভাগ্যের পথের সন্ধান দানকারীর উপদেশ মনোযোগ সহকারে শুনবে।

১২. অর্থাৎ তার মৃত্যু হবে না। যার ফলে আযাব থেকে রেহাই পাবে না। আবার বাঁচার মতো বাঁচবেও না। যার ফলে জীবনের কোন স্বাদ-আহলাদও পাবে না। যারা আল্লাহ ও

তাঁর রসূলের উপদেশ আদৌ গ্রহণ করেনি এবং মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত কুফরী, শিরক বা নাস্তিকতাবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল তারাই এ শাস্তি লাভ করবে। আর যারা মনের অভ্যন্তরে ঈমানকে পোষণ করে কিন্তু নিজেদের খারাপ কাজের দরুন জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে তাদের সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছে, তারা নিজেদের শাস্তি ভোগ করার পর আল্লাহ তাদের মৃত্যু দান করবেন। তারপর তাদের পক্ষে শাফা'আত কবুল করা হবে। তাদের অগ্নিদগ্ধ লাশ এনে জান্নাতের ঝরণার কিনারে ফেলে দেয়া হবে। জান্নাতবাসীদের বলা হবে, ওদের ওপর পানি ঢালো। বৃষ্টির পানি পেয়ে যেমন মৃত উদ্ভিদ জীবন্ত হয়ে ওঠে ঠিক তেমনি জান্নাতের পানি পেয়ে তারাও জেগে উঠবে। এ সম্পর্কিত হাদীস মুসলিমে হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে এবং বায্যারে হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে।

১৩. পবিত্রতা অর্থ কুফর ও শিরক ত্যাগ করে ঈমান আনা, অসৎআচার–আচরণ ত্যাগ করে সদাচার অবলম্বন করা এবং অসৎকাজ ত্যাগ করে সৎকাজ করা। সফলতা বলতে পার্থিব সমৃদ্ধি বুঝানো হয়নি বরং আসল ও সত্যিকার সফলতার কথা বুঝানো হয়েছে। এর সাথে পার্থিব সমৃদ্ধি অর্জিত হোক বা না হোক তাতে কিছু আসে যায় না। (ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন সূরা ইউনুস ২৩ টীকা, আল মু'মিনুন ১, ১১, ৫০ টীকা এবং সূরা লুকমান ৪ টীকা।)

১৪. 'স্মরণ করা' বলতে আল্লাহকে মনে মনে স্মরণ করা এবং মুখে তা উচ্চারণ করাও বুঝানো হয়েছে। এই উভয়টিই যিকরুল্লাহ বা আল্লাহকে স্মরণ করার অন্তরভুক্ত হবে।

১৫. অর্থাৎ কেবল স্মরণ করেই ক্ষান্ত হয়নি বরং নিয়মিত নামাযও পড়ে সে প্রমাণ করেছে যে, যে আল্লাহকে সে নিজের ইলাহ বলে মেনে নিয়েছে কার্যত তাঁর আনুগত্য করতেও সে প্রস্তুত এবং তাঁকে সর্বক্ষণ স্মরণ করার জন্য সে ব্যবস্থা অবলম্বন করছে। এই আয়াতে পর্যায়ক্রমে দু'টি কথা বলা হয়েছে। প্রথমে আল্লাহকে স্মরণ করা তারপর নামায পড়া। এ অনুযায়ী 'আল্লাহু আকবার' বলে নামায শুরু করার পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাযের যে পদ্ধতির প্রচলন করেছেন তার সকল অংশই যে কুরআনের ইশারা–ইংগিত থেকে গৃহীত, এটি তার অসংখ্য প্রমাণের অন্যতম। কিন্তু আল্লাহর রসূল ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তির পক্ষে এই ইংগিতগুলো জমা করে নামাযকে এ আকারে সাজানো কোনক্রমেই সম্ভবপর ছিল না।

১৬. অর্থাৎ দুনিয়া ও তার আরাম–আয়েশ এবং তার স্বার্থ ও আনন্দ স্বাদ লাভ করার জন্যই তোমাদের সমস্ত চিন্তা ও কর্মপ্রচেষ্টা উৎসর্গিত। তোমরা মনে করে থাকো, এখানে যা কিছু পাওয়া যায়, তাই নীট লাভ এবং এখানে যা থেকে বঞ্চিত হও তাই তোমাদের জন্য আসল ক্ষতি।

১৭. অর্থাৎ আখেরাত দু'দিক দিয়ে দুনিয়ার মোকাবিলায় অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য। প্রথমত তার সুখ, স্বাচ্ছন্দ, আরাম–আয়েশ দুনিয়ার সমস্ত নিয়ামতের চাইতে অনেক বেশী ও অনেক উচ্চ পর্যায়ের। দ্বিতীয়ত দুনিয়া ধ্বংসশীল এবং আখেরাত চিরস্থায়ী।

১৮. এই দ্বিতীয়বারের মতো কুরআনে হযরত ইবরাহীম (আ) ও হযরত মূসা (আ)–এর সহীফা শিক্ষার বরাত দেয়া হয়েছে। এর আগে সূরা আন নাজ্মের তৃতীয় রুকূ'তে আর একবার এ ধরনের বরাত দেয়া হয়েছে।